কুহেলিকাময় তপোভূমি হিমালয়

চিরশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

কুয়াশার চাদরে ঘেরা উত্তুঙ্গ পার্বত্য প্রদেশ হিমালয়। যুগে যুগে যা মানুষকে মুগ্ধ করেছে, জাগিয়েছে বিস্ময়! মহাকবি কালিদাস তাঁর মহাকাব্য 'কুমারসম্ভবে' তার গৌরবগাথা গেয়ে বলেছেন,

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥"

এই শ্লোকটি স্বামী বিবেকানন্দ অসামান্যভাবে বিবৃত করেছেন যা পাওয়া যায় কে এস রামস্বামী শাস্ত্রীর বাল্যকালের স্মৃতিচারণায়। স্বামীজী তুলে ধরেছেন, হিমালয় শুধু বহু ঋষি-মুনির আবাসভূমিই নয়, অজস্র প্রতিকূলতার মাঝে ভারতের রক্ষাকর্তাও। ভারতের শীর্ষে তার খাড়াই উপস্থিতি মানদণ্ডের কাজ করে, দেখায় বিশ্বচরাচরের মাঝে ভারতীয় সভ্যতার উৎকর্ষ!

সেই হিমালয়ের টানে যুগে যুগে আকৃষ্ট হয়েছেন বহু জ্ঞানিগুণিজন। তুষারাবৃত দুর্গম প্রান্তরে তাঁরা জীবন পণ করে খুঁজে ফিরেছেন ইতিহাসকে। পাহাড়িদের মাঝে বিলিয়েছেন জ্ঞান, শিক্ষা। সন্ধান করেছেন শান্তির। বিশ্বের সমস্ত জাতি ও ধর্মাবলম্বীদের আকর্ষণ করেছে হিমালয়। এসেছেন তাঁরা তিব্বতের দুরূহ দুর্গম পথ ভেঙে, ভারতের অনুসন্ধানে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য আর গৌরব এই হিমালয়। তার সৌন্দর্য চিরদিন সর্বস্তরের মানুষকে বিমোহিত করেছে। তাই মানুষ বারেবারে এসেছে তার আকর্ষণে। মেতেছে অজানার অন্বেষণে। খুঁজেছে তাদের প্রাণ ও মনের ধন এবং তপস্যার সম্পদকে ওই তুষারঢাকা অনন্ত শিখরসারির মাঝে!

তিব্বত আগে ভারতভূমির এক অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ ছিল। যুগে যুগে বহু মানুষ এসেছে তিব্বতে—কেউ রেশম পথের খোঁজে, কেউ বা পামীর লঙ্ঘনের আনন্দ নিতে, আবার কেউ মধ্য এশিয়া খুঁজে দেখার আগ্রহে। এভাবেই মধ্য এশিয়ার দিকে যাত্রা করে বহুদিন নিখোঁজ ছিলেন বিবেকানন্দ-ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর মা ভুবনেশ্বরী দেবী ছ-বছর ছেলের খবর না পেয়ে খুবই চিন্তিত থাকতেন। স্বামী অভেদানন্দ যাত্রা করেছিলেন তিব্বত অভিমুখে ১৯২২-২৩ সালে। তারও কুড়ি পঁচিশ বছর আগে স্বামী অখণ্ডানন্দ তিব্বত

বিবেকানন্দ-নিবেদিতা গবেষক, 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' রচয়িতা শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর প্রপৌত্রী

পারাপার করেছেন অতি অল্প বয়সে। ১৮৮৭ সালের পর থেকে তিনি তিন-তিনবার হিমালয়-তিব্বত ভ্রমণ করেছেন ও ফিরে এসেছেন ১৮৯০ সালে। সেই বছরের জুলাই মাসে তিনি পরিব্রাজক স্বামীজীর সঙ্গী হয়ে রওনা দেন হিমালয়ের পথে। আর শ্রীশ্রীমা সারদা তাঁকে ভরসা করে বলেন, ''আমাদের সর্বস্ব তোমার হাতে দিলাম। নরেনের খেয়াল রেখো।''

ভারতভূমি থেকে যাঁরা পাড়ি দিয়েছেন তিব্বতের ওই রহস্যময় প্রান্তর-অভিমুখে, তাঁদের মধ্যে বাংলার জ্ঞানী পুরুষ অতীশ দীপঙ্করের কথা সর্বাগ্রে মনে আসে। ৯৮০ সালে তাঁর জন্ম হয়েছিল এক রাজপরিবারে, বিক্রমমণিপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে (অধুনা মুনশিগঞ্জ)। তিনি অতি অল্প বয়সেই হীনযানী ও মহাযানী কঠিন সব লিপি রপ্ত করেছিলেন। পাণ্ডিত্যে বহু ব্রাহ্মণকে পরাস্ত করে শেষে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন রাহুলগুপ্তের কাছে। মাত্র উনিশ বছর বয়সে তিনি মগধ রাজ্যের ওদন্তপুরী বিহারের সন্ন্যাসী শীলরক্ষিতের কাছে দীক্ষিত হন। তাঁর কাছে 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান' উপাধি লাভ করেন। সংসার ত্যাগ করে সঙ্ঘে যোগদান করেন। সমৃদ্ধ হন জ্ঞানী-গুণিজনের সাহচর্যে। এছাড়া জাভাতে গিয়ে দীর্ঘ বারো বছরে দক্ষতা আনেন বুদ্ধের শিলালিপিতে। অবশেষে তিনি মগধরাজের অনুরোধে 'বিক্রমশিলা মহাবিহারে'র মূল অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁর যশোগাথা ছড়ায় সুদূর তিব্বত পর্যন্ত। সেখানকার রাজা দীপঙ্করকে তাঁর দেশে আসার আমন্ত্রণ জানালেন। অজানার হাতছানি ডাক দিয়ে গেল তাঁকে! ১০৩৯ সালে ষাট বছর বয়সে রওনা দিলেন তিব্বত অভিমুখে; হিমালয় লঙ্ঘন করে পৌঁছলেন সেখানে।

রাজার কাছে আন্তরিক সমাদর লাভ করেন তিনি। বৌদ্ধধর্মকে ত্রুটিমুক্ত করে তিনি শুদ্ধ ধর্মধারার মাধ্যমে উন্নত করে তোলেন সেখানকার মানুষজনকে। জয়যুক্ত হয় তাঁর গৌরব। ১০৫৩ সালে তাঁর দেহাবসান হয়। তিনি আজও তিব্বতিদের কাছে মান্য হন বুদ্ধের পরবর্তী পদমর্যাদায়। তাঁর স্মারক স্তম্ভ একইভাবে লামাদের কাছে এখনও রয়েছে। সংস্কৃত ও তিব্বতি ভাষায় তাঁর একশোর ওপর লিখিত গ্রন্থ আছে।

আরও এক পূর্বভারতীয় পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন, যিনি বেদান্ত, আর্যসমাজী, বৌদ্ধধর্ম ও মার্কসের ধারাকে আয়ত্ত করেছিলেন অনায়াসে, পাড়ি দিয়েছিলেন বার চারেক সেই দেশে, কুহেলিকাময় রহস্যের হাতছানিতে। তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল বিহারে রাম উদর দাস নামে। কিন্তু জ্ঞানতৃষ্ণা তাঁকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে দেশদেশান্তরে; পরিপূর্ণ করেছে জ্ঞানের আলোকে। অতি অল্প বয়সেই করেছে বিশ্বপথিক। তিনি গেছেন ইউরোপ, জাপান, চিন, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, ইরান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান। সাইবেরিয়া পার হয়েছেন ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলে—আর ভ্রমণ করেছেন হিমালয়। কিন্তু তিব্বত ভ্রমণ যে অভিনব অভিজ্ঞতায় ও ভয়ংকরতায় সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিল সেকথা তিনি নিজে স্বীকার করেছেন। বহু ভাষা শিখে, বহু জ্ঞান আহরণ করেও লিখেছেন ভ্রমণ অভিজ্ঞতাগুলি মাতৃভাষা হিন্দিতে—'যাত্রা কে পন্নে' আর 'তিব্বত মে সওয়া বর্ষ' নামের দুটি গ্রন্থে। তিব্বত এবং বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিলই, সেটি আরও বেড়ে যায় আলেকজান্দ্রা ডেভিড নিলের হিমালয়-তিব্বত লঙ্ঘনের অভিজ্ঞতা পড়ে। ইনি প্রথম ইউরোপীয়ান মহিলা যিনি ১৯২৪ সালে পঞ্চান্ন বছর বয়সে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে লাসা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। এভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করে রাহুল বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন; রাম উদর দাস থেকে হয়ে ওঠেন রাহুল সাংকৃত্যায়তন।

শিখদের প্রথম ও পরম গুরু নানক ছিলেন এমন

এক আধ্যাত্মিক পুরুষ, যিনি অজানার ডাকে বেরিয়ে পড়তে ভালবাসতেন। তাঁর চারটি দীর্ঘ অধ্যাত্ম যাত্রার, যাকে পাঞ্জাবিতে 'উদাসী' বলে, একটি ছিল হিমালয় অভিমুখে। ১৫১৫ থেকে ১৫১৮-র মধ্যে এক সময়ে তিনি হিমালয়ের বিস্তৃত অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন; গিয়েছিলেন তিব্বতেও। ঘুরে ঘুরে দুর্গম প্রান্তের মানুষদের কাছে তিনি জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতেন। পথভ্রষ্টকে দেখাতেন পথ।

গুরু নানক লাদাখ-কাশ্মীর অঞ্চলের বাসিন্দাদের শুনিয়েছিলেন তাঁর অমৃতবাণী। পরে তাঁর যাত্রাকে স্মরণীয় করে রাখতে ভক্তরা সেসব জায়গায় তৈরি করেছিলেন গুরুদ্বার। তার একটির নাম 'পাথরসাহিব'। লে-র কাছে anti-gravity hill-এর পাশে ১৫১৭ সালে এটি তৈরি হয়েছিল। লাদাখের জনমানবহীন ধূ-ধূ প্রান্তরের মাঝে তাঁর ছোট্ট সুন্দর উপস্থিতি একটি মরূদ্যানের মতো লাগে।

গুরু নানক হিমাচল প্রদেশের কুলুর কাছে মণিকরণ ইত্যাদি বহু স্থান পরিভ্রমণ করেছিলেন, সেসব জায়গায় এখন গড়ে উঠেছে একাধিক গুরুদ্বার। কিন্তু তাঁর উত্তর অভিমুখের 'উদাসী' বা যাত্রাপথের সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী অংশ ছিল কৈলাসের পাদদেশে। এ-পথে তিনি চুরাশি জন সাধুর সঙ্গে মিলিত হন; যাঁদের মধ্যে গোরখনাথ ও মচ্ছেন্দ্রনাথের (মৎস্যেন্দ্রনাথ) মতো উচ্চমার্গের সাধুও ছিলেন। সেইসময় এই সাধুরা পাঞ্জাব ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল তাঁদের ক্ষমতার জোরে নিজেদের আওতায় রেখেছিলেন। সাধারণ মানুষ তাঁদের ভয় পেত এবং নানারকম দানধ্যানে তুষ্ট রাখত। সাধুরাও পাহাড়ের উঁচু স্থানে নির্জনে সাধনা করতেন ও সেই সাধনলব্ধ অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে ভীত করে রাখতেন সাধারণ মানুষকে; আর জোগাড় করতেন তাঁদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস। গুরু নানক এর প্রতিবাদ করেন। তিনি আধ্যাত্মিকতার মূল আধাররূপে সত্য, সততা ও কঠোর পরিশ্রমকে মান্যতা দিতেন।

চুরাশি সাধুর দল নানকের আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলেন। তাঁরা তাঁকে নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য পরিবর্তিত করতে চাইলেন। কথিত আছে, একটি ভিক্ষার বাটি দিয়ে তাঁকে কাছের একটি পুষ্করিণী থেকে জল আনতে বললেন তাঁরা। নানক গিয়ে দেখলেন, সেখানে জলের বদলে রয়েছে হিরে জহরত ভর্তি। তিনি খালি হাতে ফিরে এসে জানান পুকুরে জল নেই। চুরাশি সাধুর পরিকল্পনা বিফল হয়। নানক তাঁর উচ্চ দর্শন ও যুক্তি দিয়ে তাঁদের সহজেই পরাস্ত করেন। তাঁর সত্যনিষ্ঠ ও তেজোদীপ্ত সংস্পর্শে আরও বহু সাধু প্রভাবিত হন। হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে, ভরমোর নামের সেই খাড়াই দুর্গম অঞ্চলে এখন চুরাশি সাধুর নামের 'চুরাশিয়া মন্দির' বিরাজ করছে। তার একটি ঘরে অন্যান্য সিদ্ধপুরুষদের পাশে রয়েছে গুরু নানকের সবচেয়ে বড় ছবি।

পাথরসাহিব

শিখ ধর্মের সত্যের বাণী প্রচার করতে নানক উত্তর সিকিমের দুর্গমপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন যেখানে আজ তাঁর

নামে গুরুদুংমার ঝিল। গিয়েছিলেন লাচেন আর লাচুং নদীর সঙ্গমস্থল চুংগথামে, যেখান থেকে তিস্তার জন্ম। কথিত আছে যে তাঁর দেওয়া চালের মাধ্যমেই এখানে প্রথম ধান চাষের কাজ আরম্ভ হয়।

ভালবেসে যে-সন্ন্যাসী বারেবারে ফিরে এসেছেন এ-তুষাররাজ্যে, তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীনগর থেকে পত্রে লিখেছিলেন নিবেদিতাকে : "I shall not try to describe Kashmir to you. Suffice it to say, I never felt sorry to leave any country except this Paradise on earth." তাঁর পরিব্রাজক জীবনের এক বড় অংশ হিমালয়কেন্দ্রিক হওয়ার জন্য তাঁর প্রামাণ্য জীবনী 'The Life of Swami Vicekananda' গ্রন্থে 'Wanderings in the Himalayas' নামে একটি পৃথক অধ্যায় রয়েছে। পরবর্তী কালে তিনি ভারতে আগত তাঁর বিদেশিনী শিষ্যাদের হিমালয়ের বেশ কিছু অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন কাশ্মীরেও। ক্ষীরভবানী ও অমরনাথ দর্শন তাঁর মধ্যে এক অভাবনীয় পরিবর্তন এনেছিল। সিস্টার নিবেদিতা লিখিত 'Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda' গ্রন্থে তার জীবন্ত বর্ণনা আছে। স্বামীজীর এই অনন্য গভীর অনুভূতির ফসল 'Kali the Mother' কবিতাটি, যা শ্রীরামকৃষ্ণের বলা তাঁর 'জন্মসিদ্ধ' উপমার যথার্থতা দেখায়। এটি তিনি লিখেছিলেন ক্ষীরভবানী দর্শনের পরে। কাশ্মীরের রূপে মুগ্ধ নিবেদিতাও পহলগাঁও-এর সুন্দর ছবি এঁকেছেন 'Master as I Saw Him' গ্রন্থে।

কুমায়ুন হিমালয় স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। নৈনিতালের কাছে স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তিনি এসে পৌঁছন কাঁকড়িঘাট নামক একটি নির্জন স্থানে। কুশী নদীর ধারায় স্নান সেরে একটি বটগাছের নিচে ধ্যানস্থ হন। ধ্যানভঙ্গ হলে অখণ্ডানন্দকে বলেন যে এই বটগাছের নিচে আজ তিনি তাঁর জীবনের একটি বৃহত্তম সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। জানতে পেরেছেন microcosm আর macrocosm-এর মধ্যেকার সম্পর্ক ও পার্থক্য। পরবর্তী কালে ১৮৯৬ সালে তিনি এই বিষয়ে "The Cosmos : The Microcosm and the Microsm"-এর ওপর আমেরিকায় একাধিক বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন।

ইউরোপ ভ্রমণকালে আল্পস দেখেছিলেন স্বামীজী। মনে পড়ে গিয়েছিল তাঁর একান্ত প্রিয় হিমালয়ের কথা। দেশে ফিরে তিনি আলমোড়ায় যান। হিমালয়ের কোলে সঙ্ঘের একটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েন। এই বিশেষ কেন্দ্র প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "Here... must be one of those centres, not merely of activity, but more of calmness, of meditation, and of peace, and I hope some day to realize it." বিবেকানন্দের এই অভিনব স্বপ্নকে রূপায়িত করতে এগিয়ে এলেন তাঁর দুই বিদেশি ভক্ত—ক্যাপটেন জেমস হেনরি সেভিয়ার ও তাঁর স্ত্রী শারলট এলিজাবেথ সেভিয়ার। সঙ্গে পেলেন স্বামীজীর দীক্ষিত সন্তান স্বামী স্বরূপানন্দকে। সর্বস্ব পণ করে লেগে পড়লেন তাঁরা। সেভিয়ার দম্পতি বিলিয়ে দিলেন তাঁদের সব সম্পত্তি স্বামীজীর সাধের মায়াবতী অদ্বৈত বেদান্ত আশ্রম গড়ে তুলতে। উৎসর্গ করলেন নিজেদের জীবন, মায়াবতীর কোলে। বাঁধা পড়লেন কুমায়ুনের অধ্যাত্মসুবাসে ঘেরা মায়াবী পরিমণ্ডলে!

কাকড়িঘাটকে কেন্দ্র করে নিম করোলি বাবা নামে আর এক যোগীর প্রসঙ্গ উঠে আসে, যিনি তাঁর সাধনার ভূমিরূপে বেছে নিয়েছিলেন কুশী নদী ও বটবৃক্ষ দিয়ে ঘেরা সেই নির্জন প্রান্তরকে। সাধনায় তিনি এমন কিছু ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন যা দেখে মানুষ তাঁকে 'চমৎকারী বাবা' নামেও

কাকড়িঘাটের পথে

সম্বোধন করত। ভক্তি ও শক্তির আধার শ্রীমহাবীর হনুমান ছিলেন তাঁর উপাস্য। আজও কাকড়িঘাটের শান্ত বন্য পরিবেশে নিম করোলি বাবার আশ্রমটি মন ভোলায়।

গাঢ়ওয়াল হিমালয়ের প্রসঙ্গ উঠলে স্বামীজী ও স্বামী অখণ্ডানন্দের কথা স্মরণে আসে। তাঁরা উভয়ে অলকানন্দা, টেহরী, শ্রীনগর (গাঢ়ওয়াল), গণেশপ্রয়াগ, হৃষীকেশ ও হরিদ্বারের এক বড় অংশ ভ্রমণ করেছিলেন। লাভ করেছিলেন অভিনব সব অভিজ্ঞতা। অখণ্ডানন্দজী ১৮৮৭ থেকে দশ বছর প্রায়ই একাকী ভ্রমণ করেছেন হিমালয়ে। তাঁর সহজ সুন্দর ভাষায় লেখা মায়াবী রহস্যময় হিমালয়ের টুকরো টুকরো অদ্ভুত অভিজ্ঞতাগুলি প্রকাশিত হয় 'বসুমতী' ও 'উদ্বোধন' পত্রিকায়, যেগুলি বই হিসেবে প্রকাশিত হয় পরবর্তী কালে। কখনও তিনি পাগল বেশধারী সাধুর হাতে জীবন ফিরে পান, আবার কখনও অধ্যাত্মসম্পদের খনি খুঁজে পান পাহাড়ের সৌন্দর্য ও অখণ্ড নিস্তব্ধতার আড়ালে। তাঁর অনন্য অনুভূতির ঝুলি উজাড় করা অভিজ্ঞতাগুলি হিমালয়কে এক প্রহেলিকাময় দেবভূমিরূপে দেখতে শেখায়। জাগায় রোমাঞ্চ!

স্বামী অভেদানন্দ পরিব্রাজনকালে হিমালয়ের এক বড় অংশ ঘুরে তিব্বত অভিমুখে যাত্রা করে লাসা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। লাদাখের লে-র কাছে হিমিস মনাস্ট্রিতে থাকাকালীন একটি অভাবনীয় তথ্যের সন্ধান পান তিনি। সেখানে তাঁর এক তিব্বতি দোভাষী লামার সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁর মাধ্যমে তিনি যিশুর জীবনী লেখা একটি অভিনব গ্রন্থ দেখতে পান। গ্রন্থটি যিশুর মৃত্যুর দুশো বছর পরে ভারতবর্ষ ঘুরে লাসা লাইব্রেরিতে আসে; সেখান থেকে হিমিস মনাস্ট্রিতে। তা থেকে অভেদানন্দ জানতে পারেন যে যিশুখ্রিস্ট ষোলোটি বছর কাটিয়েছিলেন এই তিব্বত-লাদাখ অঞ্চলে। একই গ্রন্থ নজরে পড়ে নিকোলাস নোটোভিচ নামের এক ফরাসি অভিযাত্রীর। তিনিও এক দোভাষী লামার সাহায্যে গ্রন্থটির বিষয়ে অবগত হন; তা লিখে ফেলেন নিজের ভাষায়। পরবর্তী কালে এক আমেরিকানের মাধ্যমে তা ইংরেজিতে অনূদিত হয়—'The Unknown Life of Jesus Christ' নামে।

অতন্দ্র প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে হিমালয় ভারতের উত্তর থেকে পূর্বপ্রান্ত জুড়ে। তার কঠিন জীবন, অধ্যাত্মচেতনা আর কুয়াশার পর্দার পিছনের অজানার হাতছানি আকর্ষণ করে এসেছে বিশ্বের মানুষকে, তার সৃষ্টির কাল থেকে। আজও সেই ক্রম ব্যাহত হয়নি, বরং বেড়েছে নিরন্তর। সে যত সুন্দর, ততই ভয়ংকর। তবু সে টানে। মানুষ ছুটে যায় তার রহস্যের মায়াজালের পিছনের জগতটাকে খুঁজে দেখার আকাঙ্ক্ষায়। কখনও ফিরে আসে পরিতৃপ্তির ঝুলি পূর্ণ করে, আবার কখনও হারিয়ে যায় তার রহস্যময় যবনিকার আড়ালে!! ✠